হায় ! আমাদের শান্তিনিকেতন

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদ : ২৫ মার্চ, ২০০৪ : ''চুরি হয়ে গেছে রবিকোষে '' । এক অবিশ্বাস্য আঘাত রবিঠাকুরের ওপর। সরাসরি চুরি। তাঁর নোবেল পদক, অসামান্য সব উপহার, দুর্মূল্য নথি, এবং আরো অনেক সমারক। যে সমৃতি-চিহ্নগুলির মাধ্যমে আমরা আজও রবীন্দ্রনাথকে আমাদের কাছে ধরে রাখতে পারি, যে চিরসংরক্ষণীয় নিদর্শনগুলির মূল্য কোনো টাকার অঙ্কে নির্ধারণ করা যায় না, সেরকম একগাদা অমূল্য সামগ্রী বেমালুম উধাও হয়ে গেল 'উত্তরায়ণে'র বিচিত্রা থেকে। কোনো হদিস নেই। .....নিরাপত্তা ব্যবস্থার চূড়ান্ত গাফিলতি তো বটেই, তাছাড়াও হয়ত গভীর আরো কিছু আছে।.... কত বড় অপদার্থতা বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের , কত বড় গাফিলতি প্রশাসনের , কত বড় লজ্জা বাংলার , বাঙ্গালীর ! যত দিন যাচ্ছে ততই প্রকাশ পাচ্ছে -- বিশ্বভারতীর পরিচালন-ব্যবস্থা আর সংগ্রহশালার কর্মীবাহিনীর ভেতর বাসা নিয়ে আছে ঘোরেল রাজনীতির ঘুঘুচক্র। ক্ষোভে- দুঃখে -মর্মবেদনায় স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে ফেটে পড়ার কথা গোটা রাজ্যবাসীর। নোবেল পদক কোন ছাড়, অপহৃত কোনো কিছুই এখনো উদ্ধার হয়নি ; ওদিকে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এরমধ্যেই বিমা কোম্পানির কাছে ২ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা দাবি করে বসেছে।

* * * *

সংবাদ : ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ : '' রবীন্দ্রনাথের খোয়াইয়ের হদিস নেই শান্তিনিকেতনে , বললেন সোমনাথ '' ।
বোলপুরের এক প্রবীণ ভিক্ষাজীবী বাউল বলেছিল স্টেশনে দাঁড়িয়ে, -- দেখেছেন ? সোমনাথ চ্যাটার্জি, আমাদের এখানকার-ই এম পি। উনি খোয়াইয়ের হদিস খুঁজে পাচ্ছেন না ! রবিঠাকুরের প্রাণের খোয়াই, আমাদের তিন পুরুষের খোয়াই, তার হদিস নেই ? থাকবে কি করে, সব বেচেবুচে লোপাট করে দিলে কি হদিস থাকে ?
-- আপনারা তো এখেনে আসেন, দেখেন, তারপর বাড়ি ফিরে যান। কিছু করুন ! আপনাদের কি কোনো দায়িত্বই নেই ?
..... বড় অপরাধী করে দিয়েছিল আমাকে সেই বাউল।

কোলকাতা থেকে ১৬০ কিলোমিটার দূরে বোলপুরের শান্তিনিকেতনে দেবেন্দ্রনাথ খুঁজে নিয়েছিলেন তাঁর সাধনার 'আশ্রম'। ৩ মাইল দক্ষিণে অজয় নদী , ২ মাইল উত্তরে কোপাই, তিন পাশে ধানক্ষেত আর বনানীর স্নিগ্ধ শ্যামলিমা ; আর উত্তর-পূর্ব কোল জুড়ে ছিল রুক্ষ রক্তিম খোয়াই -- '' উর্মিল লাল কাঁকরের নিস্তব্ধ তোলপাড় '' । আশ্চর্য সুন্দর এই খোয়াইয়ের গড়ন ।

প্রায় ৩০০ বছর আগে থেকেই জঙ্গল হাসিল হচ্ছিল বীরভুমে , মাটির বাঁধন আলগা হয়ে আসছিল। প্রতিবার বৃষ্টির ধারায় নরম লাল মাটি ধুয়ে ধুয়ে উঠে গেছে, বয়ে গেছে ক্ষীণসোতা নদী-উপনদী হয়ে, উন্মোচিত করে দিয়ে গেছে তলদেশের তরঙ্গ-বন্ধুর কঠিন মাটির স্তরকে, তৈরি হয়েছে খানা খন্দর স্তূপ গহ্বর। খোয়াই। রবিঠাকুরের আবাল্য সঙ্গী, শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি আর ঐতিহ্যের সাথে লীন, ''গ্রান্ড ক্যানিয়নে''র ক্ষুদ্র সংস্করণ অনবদ্য খোয়াই আজ লাঞ্ছিত, নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

অথচ শান্তিনিকেতন প্রকৃত অর্থেই ছিল শান্তি আর আনন্দের আদর্শ নিকেতন। ১৯০১ সালে মাত্র পাঁচজন ছাত্র নিয়ে যে 'পাঠভবন' গড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সেই কচি কিশলয় ক্রমে বিকশিত হয়ে হয় 'বিশ্বভারতী' , ১৯২১ সালে। অনাবিল শ্যামল প্রকৃতি, আশ্রমিক, আবাসিক, স্থানীয় আদিবাসী মানুষ। রবীন্দ্র-অনুরাগী বুদ্ধদেব লিখেছেন - ''এখানে আকাশে বাতাসে

পাখির গানে ইন্দ্রিয় নন্দিত হয়, হৃদয় মধুরতায় ভরে যায়, আবার বুদ্ধিবৃত্তিতে নিদ্রালুতা আসে না, ইচ্ছে করলেই তার চরম চর্চা করা যায়। নির্জনতার অভাব নেই, গুণীজনসঙ্গও আছে হাতের কাছে। নগরের হৃদয়হীনতা নেই, নগরের নৈর্ব্যক্তিকতা আছে। পাড়াগাঁর ধূর্ত কুটিলতা নেই, অনাড়ম্বরতা আছে। শান্তিনিকেতন ... এক হিসেবে ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী বটে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে যা কিছু মূল্যবান সব এখানে প্রকাশিত, কিন্তু তাতে মিশেছে নবীন ইওরোপের প্রাণপূর্ণতা।''
[*সব পেয়েছির দেশে*: বুদ্ধদেব বসু। বিকলপ, ১৯৪১]

এই ছিল আমাদের গর্বের শান্তিনিকেতন, ছিল ভালোলাগার অনিবার্য আকর্ষণ। আর ছিল - ''পশ্চিমে বাগান বন চষা-খেত/ মিলে গেছে দূর বনান্তে বেগনি বাষ্পরেখায় ;/ মাঝে আম জাম তাল তেঁতুলে ঢাকা/ সাঁওতাল-পাড়া ;'' [*খোয়াই*: রবীন্দ্রনাথ । পুনশ্চ , ১৯৩২] এই সাঁওতাল সমাজ শান্তিনিকেতনের সাংস্কৃতিক সামাজিক জীবনের অঙ্গ হয়ে ছিল। পরিশ্রমী সরল জীবন, আনন্দ কুড়িয়ে নেওয়ার মত অপরূপ শরীর আর মন। ওরা উঠে এসেছিল রামকিঙ্করের দেশজ উপকরণে তৈরি ভাস্কর্যে, নন্দলালের চিত্রে, বিনোদবিহারীর মুরালে।

এই সবই ''ছিল''। আজ লাঞ্ছিত, বিস্মৃত যেন। নব্য-আধুনিকতা আর বিত্ত-সম্ভোগের অনুপ্রবেশ শান্তিনিকেতনের স্বাতন্ত্র লুণ্ঠন করেছে ধীরে ধীরে।

সত্তরের দশক থেকে বিত্তশালীদের 'শখের' বাড়ি উঠতে শুরু করেছে যত্র তত্র , কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা পরিকাঠামো ছাড়াই। এর অনিবার্য ফল হিসেবে শান্তিনিকেতন জুড়ে গজিয়ে উঠেছে অজস দোকান-পাট হোটেল-রেস্তোঁরা রোল-চাউমিনের কিয়স্ক। প্রথম বড় ধাক্কাটা এসেছে আদিবাসী সাঁওতালদের ওপর। চাষের জমি, জঙ্গল আর খোয়াই প্রান্তর ক্রমাগত পাকা বাড়ির দখলে চলে যাওয়ায় ওরা ঘর হারিয়েছে, পেশা হারিয়েছে, সরে যেতে বাধ্য হয়েছে নিজ ভূমি থেকে দূরে, পরিণত হয়েছে ঝুপড়ি-বাসী দিনমজুর রিক্সাচালক কিংবা বাবুর বাড়ির পরিচারকে। আশির দশকে এসে গুরুপল্লী পূর্বপল্লী রতনপল্লী ভুবনডাঙা ফুলডাঙা রীতিমত ঘিঞ্জি এলাকা। যথেচ্ছ অপরিকল্পিত গৃহনির্মাণ অনিবার্যভাবে এনে দিয়েছে সমস্যা -- পানীয় জল, নিকাশী ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্যের সমস্যা।

অথচ এই সমস্যা নিরসনে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ছিল, সুযোগও ছিল। ভারত সরকার সে-ই ১৯৫১ সালে প্রবর্তন করেছিল ' বিশ্বভারতী অ্যাক্ট ' -- বিশ্বভারতীর স্বকীয়তা, সংস্কৃতি, পরিবেশ, অক্ষত রাখার উদ্দেশে। খোয়াই-সহ ৩০০০ একরের (১১.৫ বর্গ কিলোমিটার) শান্তিনিকেতন এলাকায় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া গৃহ, আবাসন , বা কোনো নির্মাণ নিষিদ্ধ করা হয়। সে সময় তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ, প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এই অ্যাক্ট-এর সমর্থনে বলেন -- কবিগুরুর আশ্রমের পবিত্রতা রক্ষায় আমরা দায়বদ্ধ , শান্তিনিকেতন আমাদের জাতির গর্ব। ১৯৮৪ সালে বিশ্বভারতী অ্যাক্ট-এর সংশোধনী (অ্যামেন্ডমেন্ট) গৃহীত হয়, কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ-অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়। অথচ, হাতে পাওয়া সেই অধিকার প্রয়োগের কোনো চেষ্টা বা ইচছা দেখা যায় না কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে। পড়াশুনার পরিবেশ, শিক্ষক ও ছাত্র নিবাস, পাঠাগার, সংগ্রহশালা, সবই অবহেলায় নষ্ট হতে থাকে। উপরন্তু তাঁদের নির্বিকার প্রশ্রয়ে ব্যবসায়িক বিস্তার বাড়তে থাকে শান্তিনিকেতন অঙ্গণে।

উৎকট নগরায়ণের দাপটে আশির দশকে যা ছিল সমস্যার দুর্ভাবনা, নব্বুই-এর পর থেকে তা সংকটের চেহারা নেয়। সত্তর-আশিতে স্থানীয় জমির মালিকরা টুকরো টুকরো জমি বেচেছে অর্থাভাবে, আর নব্বুই থেকে ঢালাও জমি বিক্রির দায়িত্ব নিল সরকারি সংস্থা 'এস এস ডি এ' (SSDA) অর্থলোভে। ১৯৯৩ সালে তৈরি হয় বৃহৎ 'প্রান্তিক উপনগরী' শান্তিনিকেতন প্রান্তরেখায়, রেললাইনের ওপারে। ধানক্ষেত লোপাট হল, অবশিষ্ট জঙ্গল সাফ হল, খোয়াই ক্ষীণতর হল, আদিবাসী জনগোষ্ঠী তাদের শেষ আশ্রয় ঝুপড়ি থেকে উচেছদ হয়ে ভিখারি হয়ে গেল। ..... উন্নয়নের অন্তরালে অন্ধকারের সেই পরিচিত কাহিনী।

এস এস ডি এ --'শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদ' (SSDA), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের একটি সংস্থা, গঠিত হয়েছিল ১৯৮৯ সালে, যার কর্ণধার সাংসদ সোমনাথ চ্যাটার্জি। ৪৪ টি মৌজার সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পর্ষদকে। এর মধ্যে ৩৯ টি মৌজা শান্তিনিকেতন এলাকায়, যার ভেতর রয়েছে হাজার একরের খোয়াই অঞ্চল। ক্ষমতা অনেক। ভালো কাজের অনেক সুযোগ। তবু এতকাল সেরকম 'কাজের কাজ' বিশেষ নজরে পড়েনি। .... ভুল বললাম , জামবনিতে 'গীতাঞ্জলি' তৈরি করেছে এস এস ডি এ। বলিউড স্টাইলের এই ঝকমকে কলাকেন্দ্র নজরে না পড়ে যায় না। আর, না বলে উপায় নেই, শান্তিনিকেতন বা শ্রীনিকেতনে উন্নত নাগরিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হল না আজও -- রাস্তাঘাট, সেচ খালের সংস্কার, মিউজিয়াম এবং শিক্ষক ও ছাত্র নিবাসের সংস্কার ,উচ্ছেদ হওয়া স্থানীয় মানুষের পুনর্বাসন -- কোনো কিছুতেই উন্নয়নের হাত পড়েনি। সবচেয়ে বড় কথা, গত চোদ্দ বছরে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও রচনা করতে পারেনি এস এস ডি এ, অন্তত জনসমক্ষে সেরকম কিছু প্রকাশিত হয় নি।

দায়িত্ব আর ক্ষমতার অভাব না থাকলেও অর্থের অভাব আছে শোনা যায়। নিশ্চই মিথ্যে নয় কারণ সরকারের সংসারে অর্থের টানাটানির কথা আমরা রোজই শুনছি। এই অনটনের মধ্যে কাজ করতে হলে কিছু অর্থের সংস্থান লাগেই। অতএব বেসরকারি বিনিয়োগ টানতে হচ্ছে পর্ষদকে, তুলে দিতে হচ্ছে শান্তিনিকেতনের গাছ-মাটি-জল আর খোয়াই বড় পুঁজির মালিকদের হাতে। এখন নাকি নতুন চোখে দেখতে হচ্ছে উন্নয়নকে। দেখি, কী দেখা যাচ্ছে ?

১৯৯৩-এ 'প্রান্তিক উপনগরী'। ২০০২-এ প্রান্তিক ষ্টেশনের কাছে খোয়াই ক্ষত-বিক্ষত করে ৭ একর জায়গা নিয়ে উঠেছে হাল ফ্যাশানের ডুপ্লেক্স বাড়ির আবাসন 'সোনার তরী' ; নির্মাতা বেঙ্গল পিয়ারলেস। এইসব বাড়ির বিত্তবান ক্রেতারা উৎসব অনুষঠানে কিংবা দু' চারদিন ছুটি কাটাতে শান্তিনিকেতন আসেন, বছরের বাকি সময় ফ্ল্যাট তালা বন্ধ থাকে। ফলে, স্বভাবতই, শান্তিনিকেতনের প্রতি দরদ বা আত্মীয়তা এঁদের জন্মায় না। তাঁরা বিলাস চান, বিনাশ হলে হোক।

২০০০ থেকেই দেখা যাচ্ছে খোয়াইয়ের বেশির ভাগটাই কংক্রিট জঙ্গলের নিচে চলে যাওয়ায় বর্ষার জল আর খানা-খন্দর-সরু খাদ ধরে বয়ে যেতে পারছে না, নগরের নিম্নাঞ্চলগুলো বর্ষায় ডুবে থাকছে। বৃষ্টিধারায় কাদামাটির জল ময়ূরাক্ষীর ক্যানেলে গিয়ে পড়ে বেড উঁচু করে দিচ্ছে, বাড়ছে বন্যা প্রবণতা, ম্যালেরিয়া আর অন্যান্য জলবাহিত রোগে বিপন্ন হচ্ছে জনস্বাস্থ্য। .... তথাপি নির্বিকার, নির্ভীক এস এস ডি এ বোধ-বুদ্ধি-বিবেক বিসর্জন দিয়ে একের পর এক বাণিজ্য করে চলেছে শান্তিনিকেতন নিয়ে, উন্নয়নের মিথ্যা অজুহাতে।

এই যেমন, গত ডিসেম্বরেই (২০০৩) শিলান্যাস হয়েছে পিয়ারলেসের '' সোনার তরী ২'' আবাসনের। ১৫ কোটি টাকার এই প্রকল্প গ্রাস করছে খোয়াইয়ের ৮.৩ একর।

পূর্বপল্লীর উত্তরে লুঠপাট হয়ে যাওয়া খোয়াইয়ের কিছু মুক্তাঞ্চল এখনো বেঁচে ছিল ; রোদ্দুর এসে পড়ছিল, পাখিরা এসে জিরোচ্ছিল, বর্ষায় তিরতিরে জলসোত বইছিল। এর ১৬ একর বিক্রি হল বেঙ্গল অম্বুজা'র কাছে, খুব সম্প্রতি।

ফুলডাঙায় ২৪ একর জমি দেওয়া হল বেসরকারি সংস্থা সূর্যি কনসালট্যান্ট-কে 'বিনোদন পার্ক' করার জন্য। এই জমিতেই আছে ৩০০ বছরের প্রাচীন ১৭ একরের লাহাবাঁধ দিঘি। পরিযায়ী পাখিরা আসে ওখানে, স্থানীয় মানুষের নিত্য প্রয়োজন মেটায় লাহাবাঁধের জল। এখন সেখানে লোহা-লক্কড় গেঁথে কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। দিঘির মাঝখানে হবে ভাসমান রেস্তোঁরা, পানশালা, বিলিতি মদের দোকান, আরো সব প্রমোদের আয়োজন।

মর্মান্তিক পরিণতির বিষন্ন চিত্র চোখের সামনে। দেয়ালে-পিঠ-ঠেকে-যাওয়া সচেতন শান্তিনিকেতনবাসীদের পক্ষে কিছু বিশিষ্ট মানুষ গত ফেব্রুয়ারিতে (২০০৪) হাইকোর্টে এক জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন, রবীন্দ্রনাথের প্রাণকেন্দ্রের নির্বোধ নিধন আশু বন্ধ করার আর্জি নিয়ে। আছেন যোগেন চৌধুরি, সুচিত্রা মিত্র, কে জি সুব্রাহমণ্যম, শ্যামলী খাস্তগীর-রা।

মহাশ্বেতা দেবি সরাসরি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে প্রতিকারের আবেদন জানিয়ে আশ্বাস পেয়েছেন। গত ৫ মার্চ শান্তিনিকেতনে দল-অদল নির্বিশেষে বহু প্রখ্যাত এবং সাধারণ মানুষের সমাবেশে সভা হয়েছে, পদযাত্রা হয়েছে , সম্মিলিত প্রতিরোধের আহ্বান উঠেছে; কোনো ভোট-শিকারী রাজনৈতিক পার্টির ''ধান্ধা''কে জায়গা দেওয়া হয় নি। এদিকে একই আর্জি নিয়ে, এস এস ডি এ-র অপকীর্তি রোধ করতে, আরেকটি মামলা রুজু হয়েছে হাইকোর্টে হাওড়ার 'গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতি'র পক্ষ থেকে।

কিছু আশার আভাস উঠে এলেও শঙ্কা কাটে না। একদিকে পর্ষদের চেয়ারম্যানের স্বৈরতান্ত্রিক 'ডোন্ট কেয়ার' মনোভাব, বিশ্বভারতী উপাচার্যের প্রত্যক্ষ সমর্থন, অনুগ্রহ-আসক্ত কিছু বুদ্ধিজীবীর দুঃখজনক আত্মবিপণন , অন্যদিকে অদালতের রায়ের অপেক্ষা। মহামান্য উচচ আদালত গত ১২ মার্চ '০৪ তার প্রথম
পর্যায়ের রায়ে লাহাবাঁধের জলাশয়কে অক্ষত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এটা প্রাথমিক সুখবর। যদিও এস এস ডি এ - কর্তৃপক্ষ একটি নিপাট মিথ্যা কথা বলেছে যে, লাহাবাঁধের জলাশয়ে কোনোরকম নির্মাণকাজ নাকি শুরু হয়নি। আজ এই মুহূর্তে, উচচ আদালতের রায় ঘোষণার দেড় মাস পরেও (২৭ এপ্রিল) যে-কেউ শান্তিনিকেতন গেলে দেখতে পাবেন লাহাবাঁধের জল পাম্প করে তুলে ফেলে মাঝখানে ভাসমান রেস্তোঁরার গোলাকার ভিত তৈরি হয়ে গেছে। ....খোয়াই খুঁড়ে নির্মাণ সম্পর্কে উচচ আদালতের শুনানি এখনো হয়নি, জানা যাবে কিছুদিন পরে। প্রত্যাশায়, প্রতীক্ষায় আছে মানুষ।

ন্যায়ালয় আইনের নিয়ম-নথি দেখেন , জনচিত্তের আবেগকে বিচারের মাপকাঠি করেন না। সেখানে দায়িত্ব থাকে সরকারের, অবশিষ্ট খোয়াইয়ের ১৬ একর জমি সরকারে 'খাস' করেই অম্বুজা'কে বিক্রি করেছে এস এস ডি এ। বাংলার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, নান্দনিক চেতনা সংরক্ষণের স্বার্থে খোয়াইয়ের বুকে কংক্রিট - উন্নয়নের উদ্যোগ বন্ধ করতে পারে রাজ্য সরকার , এটা তার সাংস্কৃতিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার দায়। ... উপাচার্য 'বিশ্বভারতী অ্যাক্ট'-এর অপব্যবহার করছেন , এখন আচার্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার সুযোগ আছে-- যদি তাঁর সদিচছা থাকে।

* * * *

তাই বলছি, উত্তরায়ণে এই নোবেল পদক আর অমূল্য সমারক-সামগ্রী চুরি হওয়া যেন এই সময়ের এক প্রতীকি ঘটনা। সবই তো চুরি হয়ে যাচ্ছে সংরক্ষণের বদলে : অনবদ্য খোয়াই, শান্তিনিকেতনের ইকোলজি ঐতিহ্য অদিবাসী-জনগোষ্ঠী, বিশ্বভারতীর 'হেরিটেজ', রবীন্দ্রনাথের সত্তা, রবীন্দ্র-ভাবনা, মূল্যবোধ .... সব তো চলে যাচ্ছে ! পণ্যকেন্দ্র হয়ে যাচ্ছে শান্তিনিকেতন আর খোয়াই। এই কি প্রাপ্য ছিল কবিগুরুর, শতবর্ষ পার হয়ে যাওয়ার পরে ? অবহেলা, অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা, বিস্মরণ -- মরণোত্তর নিদারুণ পুরস্কার ! এরই সঙ্গে কবিগুরুর প্রাপ্তি হয়েছে শিক্ষিত বাঙালি সমাজের দায়িত্বহীন নির্বিকার 'সহিষ্ণুতা'। কি করুণ পরিণতি !

ভয় হয়, বিহ্বল লাগে। যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের হর্ষে বেদনায় অবসাদে আশ্বাসে চিরজীবী হয়ে আছেন, সেই রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন, আমাদের গর্বের উত্তরাধিকার, শেষ হয়ে যাবে এইভাবে ! বাংলার মানুষ লজ্জা রাখবে কোথায় ? মনে হয় , ইথার স্পন্দনে যেন ভেসে আসছে কবিগুরুর কাঁপা কাঁপা কণ্ঠ -- '' না বাঁচাবে আমায় যদি / মারবে কেন তবে '' ।.....শুনতে পাচ্ছেন ? পাচ্ছেন তো ! কিছু একটা করুন ! কিছু তো করা যায় ! অন্তত সমস্বরে চিৎকার করে তো বলা যায় -- ' এই শান্তিনিকেতন লুণ্ঠন বন্দ্ধ হোক।' সামনে ভোট , ভোটের আগে যদি অন্যায়কে অন্যায় বলা, অপরাধকে অপরাধ বলায় বাধা থাকে, তাহলে ভোটের পরেই বলুন ; মনের ক্ষোভটাকে জাগিয়ে রাখুন , না হলে সব যে তিলে তিলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ! বাঙালীর আতমহনন আর কত মৃত্যুভূমি রচনা করবে !

- ১ মে ২০০৪

খোয়াই খনন চলছে

লাহাবাঁধের ভিত. তৈরি

সোনাঝুড়ির হাটে বিষন্ন আদিবাসী নারী

নগরায়নের অনুপ্রবেশ

পরবাসী

বিষ্ণু দে

“ .....
কোথায় সে বন, বসতিও কই বসে নি,
শুধু প্রান্তর, শুকনো হাওয়ার হাহাকার।
জঙ্গল সাফ, গ্রাম মরে গেছে, শহরের
পত্তন নেই, ময়ূর মরেছে পণ্যে।

কেন এই দেশে মানুষ মৌন অসহায় ?
কেন নদী গাছ পাহাড় এমন গৌণ ?
সারা দেশময় তাঁবু ব’য়ে কত ঘুরব ?
পরবাসী কবে নিজ বাসভূমি গড়বে ? ”

- রচনাকাল : ১৯৭৬